গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৭ - ১৩ জানুয়ারি, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিহত লক্ষ লক্ষ মানুষের স্মরণে

৩ জানুয়ারি ভারতব্যাপী শোকদিবস পালন করল এসইউসিআই

শোকবেদীতে মাল্যদান ও নীরবতা পালন

কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্য এবং এসপ্ল্যানেডে কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড মানিক মুখার্জী এবং অন্যান্যদের শোকজ্ঞাপন

কারা দায়ী

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মৃতদের ফেরাতে পারবেন না, তবে সুনামির তাণ্ডবে বিধ্বস্ত বাকি যে অসহায় মানুষজন খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়হীন হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় রয়েছে, তাদের রক্ষায় ও পুনর্বাসনে সরকার সবকিছু গড়ে দেবে। অথচ এক সপ্তাহ পরেও ঐ প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের কোনও ব্যবস্থা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না। আন্দামানের মানুষ পানীয় জলটুকু পর্যন্ত পাচ্ছে না, ফেটে যাওয়া জলের পাইপ এতদিনেও মেরামত করা হয়নি। নিকোবর কিংবা তামিলনাড়ু কোথাও প্রশাসনের খোঁজ নেই। ত্রাণসামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে যাওয়ার বদলে চলে যাচ্ছে অন্যত্র। আবার বন্টনের অভাবে গাদা হয়ে থাকছে ত্রাণসামগ্রী। এই ছবিগুলো প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলে না। আজ যদি সীমান্তে যুদ্ধ বাধত, তবে পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণের ব্যবস্থাপনায় সরকার কি এ'রকম উদাসীনতা দেখাত ? অসহায় মানুষকে খাদ্য-আশ্রয় দেওয়ার জন্য কোথায় সেই যুদ্ধকালীন তৎপরতা? তার ভগ্নাংশও সুনামি বিধ্বস্ত মানুষের জন্য দেখা যাচ্ছে না। অতীতেও যায়নি, যার মর্মান্তিক নজির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাইক্লোনবিধ্বস্ত ওড়িশার গরিব মানুষজন। বোঝা যায়, দেশের নিঃস্ব গরিব গরিষ্ঠ জনগণের প্রতি গদিসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো ও নেতাদের মমতা ও দায়বদ্ধতা নেই।

আগাম সতর্কবার্তা জারির প্রশ্নেও অপদার্থতার অভিযোগ উঠেছে সরকারের বিরুদ্ধে। প্রথমে বলা হয়েছিল, সুনামির পূর্বাভাস পাওয়ার মতো আধুনিক যন্ত্র ভারতের নেই। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক যে ব্যবস্থা আছে, তার সদস্য হওয়া বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ার দরুণ, ভারত সেই সুযোগ নিতে পারেনা। তবুও প্রশ্ন ছিলই। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইন্দোনেশিয়া-থাইল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে প্রায় ২/৩ ঘন্টা পরে ভারতের উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। এই সময়ের মধ্যে কোন ইঙ্গিত, কোনও সঙ্কেত ভারতে পাওয়া যায়নি, এটা বর্তমান প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার চমকপ্রদ অগ্রগতির সময়ে বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছিল। এখন যা খবরাখবর প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে ভারতের সরকারি মহলের স্তরে স্তরে চরম উদাসনীতা ও অপদার্থতার প্রমাণ বেরিয়ে আসছে। আবহাওয়া দপ্তর নাকি সুনামির সতর্কবার্তা পেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল পূর্বতন সরকারের মন্ত্রী এম এম যোশীর কাছে। সরকার বদল হয়ে মন্ত্রীও যে বদল হয়েছেন, আবহাওয়া দপ্তরের খাতায় নাকি সেটার উল্লেখ নেই, পুরনো

আটের পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাজ্যে ত্রাণসংগ্রহ চলছে। ২ জানুয়ারি কলকাতায় ত্রাণসংগ্রহ

এর চেয়ে ভাল ছিল নাবালক কলকাতা

ধিক্কার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নসৃষ্ট সেই সমস্ত নয়াপ্রজন্মের উদ্দাম প্রমোদকে, সওয়া লক্ষাধিক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু যাদের ইংরেজি বর্ষশেষের উৎসব পালন উপলক্ষ্যে নিশিযাপনের বেলেল্লাপনা থেকে বিরত করতে পারে না। সংবাদে প্রকাশ, মাত্র একটি বাদে কলকাতার অভিজাত ক্লাব, হোটেল, শুঁড়িখানায় ঐদিন রাতের কোন অনুষ্ঠানই বাতিল হয়নি। সব চলেছে যেমন চলার, শুধু বিশ্বের বুক থেকে মুছে গেছে বিশাল জনপদ, সওয়া লক্ষাধিক মানুষের অস্তিত্ব, যাদের বেশিরভাগই গরিব, উপকূলের বস্তিবাসী, মৎস্যজীবী।

ধিক্কার সিপিএম নেতৃত্ব ও বুদ্ধদেববাবুকে — যাঁরা উন্নয়ন আর বাস্তবতার ধূয়ো তুলে এই মানসিকতা, এই জীবনচর্যা, এই নোংরা সংস্কৃতিকেই আধুনিকতা, অগ্রগতির দিশারী বলে এর নির্লজ্জ আত্মকেন্দ্রিকতা, নগ্ন পাশবিক উল্লাসকেই মহিমময় যুগের হাওয়া বলে প্রচার করছেন। আরও লজ্জা যে, এটা ঘটেছে কলকাতা শহরে, বামপন্থী আন্দোলনের মর্যাদায় একদিন যে শহরের মাথা ছিল উঁচু; যে শহর চিরকাল অন্যায়ের মূর্ত প্রতিবাদ, আর্তের নিশ্চিত আশ্রয়। খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূকম্প — কোন বিপর্যয়েই এত লজ্জা হয়নি কলকাতার, যা হল বুদ্ধদেববাবুদের বহুপ্রশংসিত আজকের ধনী, শিল্পপতি, নয়া যুগের পুরোধাদের নির্লজ্জ হুল্লোড়ে।

এরা কারা? এরা মধ্যবিত্ত কর্মচারী নয়, শ্রমিক নয়, শহরের বস্তিবাসী-খালপাড়বাসী নয়, এরা গরিব নয়। এরা সংখ্যায় বড়জোর দশ শতাংশ। কিন্তু এরাই আজকের শাসকদের চোখে অনুসরণীয় চরিত্র, আধুনিক ভারতের প্রতিভূ। এরা কেউ অনাবাসী, কেউ বিদেশবাসী, প্রশাসক, শিল্পপতি, কোম্পানি পরিচালক — অনেককে পিছনে ফেলে এরা অর্থকৌলীন্য অর্জন করেছেন, এটাই এদের কৃতিত্ব। কেবল এক জায়গায় এদের মিল — বৃহত্তর জনগণ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। এদের দেখিয়েই জীবনে সাফল্যের দৃষ্টান্ত দেখানো হচ্ছে — শেখানো হচ্ছে ভোগই জীবন, হুল্লোড়ই আনন্দ, অর্থই পরমার্থ — তা চুরি করে, ফাটকাবাজি করে, জুয়া খেলে যেভাবেই অর্জিত হোক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে এই হল নয়া জীবনধারণা, 'বাম' 'দক্ষিণ' সব শাসকরাই যার পূজারী। না হলে বিশ্বমানের ফাটকা-পুঁজির মালিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী মহাপুরুষ হলেন কী করে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদের চোখে? আম্বানি, মিত্তল প্রমুখ ''হঠাৎ রাজা''

দুয়ের পাতায় দেখুন

এর চেয়ে ভাল ছিল নাবালক কলকাতা

একের পাতার পর

একচেটিয়া মালিকরা দেশগৌরব বলে বর্ণিত হল কী করে? মিত্তালদের ঘরের বিয়ের জাঁকজমক দৈনিক পত্রিকায় পাতার পর পাতা ঠাঁই পায় কী করে? মদ, জুয়া, রিসর্ট ক্যাবারে ট্যুরিজমের ব্যবসা উন্নয়নের তকমা পায় কী করে? তবুও ভাল, এই উদ্দাম প্রমোদের সংস্কৃতি এখনও মুষ্টিমেয় ধনী ও উচ্চবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক হওয়ার নামে এই সংস্কৃতিকে বরণ ও ধারণ করতে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদেরও প্রলুব্ধ করা হচ্ছে। এতে যদি তারা পতঙ্গের মতো ধেয়ে যায় তবে তাদের বিবেক ও মনুষ্যত্ব যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, অসহায় মানুষের দুঃখে-যন্ত্রণায় ও মৃত্যুতে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও যে তারা ভুলে যাবে — এবার লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হওয়ার সময়ও কলকাতার হোটেলে-ক্লাবে উন্মত্ত প্রমোদ তার জানান দিয়ে গেল।

দু-হাজার বছর আগে যিশু বলেছেন — সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট গলে যেতে পারে, কিন্তু ধনী কখনও স্বর্গে যেতে পারবে না। কেন বলেছিলেন এ কথা? কারণ ধনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শোষণ, অন্যায়, সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বহীনতা — সেই অর্থে মানবদ্রোহিতা। ধনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধনীর নিম্নরুচি, অপসংস্কৃতি। দেড়শো বছর আগে মার্ক্স দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী সমাজে ধনের সঞ্চয়ের পিছনে রয়েছে শ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনা, শোষণ। বস্তুগত-ভাবগত সকল উৎপাদনই এখানে পণ্য। বিনোদন, এমনকি স্নেহ-মায়া-প্রেম-প্রীতিও এখানে পণ্য। উত্তেজনা বিক্রির ব্যবসার নাম সংস্কৃতি। বর্ষবরণের নাচে গানে বাজনায় তীব্রতম উত্তেজনা, যৌন উত্তেজনার ছোঁয়া। নারী এখানে মা নয়, ভগ্নী বা কন্যা নয়, মানবীও নয়, সে ভোগের সামগ্রী। এরই প্রতিফলন টিভির চ্যানেল ধরে ঢুকছে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে। এই রুচি মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে অসাড় করে, সমবেদনা, দায়িত্ববোধকে মেরে দেয়।

কলকাতার বুকে যেদিন প্রথম নাইটক্লাব খোলা হয় — সেদিন অগ্রণী বাংলা দৈনিকে লেখা হয়েছিল — কলকাতা নাকি সাবালক হল, প্রাপ্তবয়স্ক কলকাতা প্রাপ্তমনস্ক হল। লক্ষ মানুষের মৃত্যুতে হুল্লোড় অবিরত রাখা যদি সাবালকত্ব হয় তবে তাকে ধিক্কার। এর চেয়ে ভালো ছিল নাবালক কলকাতা। শহরের রাজপথে আকালের দিনে দলে দলে 'ফ্যান দাও' বলে ছুটে আসা গ্রামের মানুষের পাশে ছিল যে কলকাতা। নাবালক কলকাতা তার উদার বুকে ঠাঁই দিয়েছিল হাজার হাজার বাস্তুহারা মানুষকে। এই কলকাতাতেই বাস্তুহারা বাজার, বাস্তুহারা কলোনি সগৌরবে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল। নাবালক কলকাতা ছিল মানুষের, মানবতার, বামপন্থী সংগ্রামের। আজ বিশ্বায়নের যুগে সাবালক কলকাতা ধনীর, মানুষের নয়।

আঠাশ বছরের একটানা সিপিএম শাসন, বিশ্বায়নের রুচির কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের অনিবার্য পরিণাম ৩১ ডিসেম্বরের রাতের ''বীভৎস মজা''। সুবর্ণরেখা ছায়াছবিতে ধনীর লজ্জাহীন প্রমোদকে ব্যঙ্গ করে সংলাপে লিখেছিলেন ঋত্বিক ঘটক, ''কলকাতায় নাকি বীভৎস মজা।'' ধিক্কার এই বীভৎস মজা, আর সেই মজার উপাসকদের, আর তার পৃষ্ঠপোষক ক্ষমতাসীন তথাকথিত বামপন্থীদের !

মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির রাজ্য সম্মেলন

শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে গত ২৪, ২৫, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবরায় প্রফুল্লনগর বিদ্যামন্দিরে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির (STEA) ৩৪তম বর্ষে ৫ম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি হিসাবে বহু তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। সম্মেলনে সহস্রাধিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি হিসাবে ছিলেন অধ্যাপক মানিক লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ছিলেন শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক ডঃ অমল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির জন্যই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। অধ্যাপক সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষার মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদী, কুসংস্কারমুক্ত মনন গড়ে তোলার পরিবর্তে অবৈজ্ঞানিক, তমসাচ্ছন্ন চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্রের মতো অবৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহকেও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত দিকটিই অধিকতর প্রাধান্য পাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকদের জীবনসংগ্রাম ও বিজ্ঞানের দর্শনগত দিকটি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব অর্জন বা চরিত্রগঠন — যা আজ চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হচ্ছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে স্বাগত ভাষণে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দকে আগামী দিনে শিক্ষার দাবিতে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সমিতির সভাপতি গোবিন্দলাল বিশ্বাস বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক রতন লস্কর তাঁর প্রতিবেদনে বিশ্বায়নের প্রভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার সর্বস্তরে ফি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ গরিব-মধ্যবিত্তের কাছ থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে মুষ্টিমেয় বিত্তবান মানুষের স্বার্থে। মালিকী শোষণের কায়দায় দিনমজুরির চেয়েও কম বেতনে মাত্র ২০০০ টাকার বিনিময়ে প্যারাটিচার নিয়োগ করা হচ্ছে। গ্রেডেশন চালু করে মাধ্যমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা বিলোপ ও জীবনশৈলী নামের আড়ালে যৌনশিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্তেরও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মপন্থা ও কর্মসূচি নিয়ে প্রতিনিধিরা দীর্ঘ সময় মতবিনিময় করেন ও সিদ্ধান্ত হয় আগামী দিনে অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনগুলিকে নিয়েও যৌথভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। তিনি জানান, আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয়ভাবে রানি রাসমণি রোডে শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান হবে এবং রাজ্যপালের নিকট দাবিসনদও পেশ করা হবে। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্বার সভাপতি নির্বাচিত হন গোবিন্দলাল বিশ্বাস। সহসভাপতি পদে পুলিন চৌধুরী, পরিমল চক্রবর্তী, তারকেশ চট্টোপাধ্যায়, তপন সামন্ত, প্রভাত ভট্টাচার্য, লোকমান হাকিম ও শশাঙ্ক ভট্টাচার্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। কোষাধ্যক্ষ পদে তাপস ব্যানার্জী এবং পত্রিকা সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদে যথাক্রমে দিলীপ মাইতি ও বনশ্রী চক্রবর্তী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায় সাধারণ সম্পাদক পদে রতন লস্কর ও সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ পোদ্দার সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

দার্জিলিং

শিলিগুড়িতে বধূহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি শহরের ৪৪নং ওয়ার্ডের গৃহবধূ বিউটি রায়কে তাঁর স্বামী স্বপন রায় ১৫ ডিসেম্বর গায়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে। ১০ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। তারপর থেকেই বিউটির উপর অমানুষিক অত্যাচার চলতে থাকে। বিউটির শাশুড়ি ছেলের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করলে তাঁকেও মারধোর করা হত। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষী স্বপন রায়ের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদিকা জয়ন্তী ভট্টাচার্য এবং সুতপা পাল।

ত্রিপুরা

আগরতলায় শিক্ষা কনভেনশন

২১ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় আগরতলার যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি হলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন আহ্বায়ক অরুণ ভৌমিক। প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন কমল রায়চৌধুরী। প্রধান বক্তা সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন, পরাধীন ভারতে মহামতি গোখলে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার উপর বেসরকারি বিল আনেন — তাতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়। স্বাধীনতার পর এত বৎসর অতিক্রান্ত হলেও সার্বজনীন শিক্ষা স্বপ্নই রয়ে গেছে। শিক্ষার কারিকুলাম সম্পর্কে তিনি বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষাকে অবহেলা করে এমন বিষয় পড়ানো হচ্ছে যা মানুষ গড়ার পরিবর্তে রোবট তৈরি করছে। তিনি বলেন, সিপিআই, সিপিএম প্রমুখ দলগুলিও কংগ্রেস-বিজেপি অনুসৃত শিক্ষানীতিই অনুসরণ করছে। পরে বক্তব্য রাখেন ডঃ পশুপতি মাহাতো। তিনি বিভিন্ন অনুন্নত ভাষা উন্নয়নের প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ককবরক ভাষার উন্নয়নে ত্রিপুরা সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। সভা শেষে খসড়া প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন নিধুভূষণ হাজরা।

পুরুলিয়া

সদর হাসপাতালে ডেপুটেশন

পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলার ১২টি ব্লক থেকে আগত শতাধিক যুবক, মহিলা, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী-বুদ্ধিজীবীদের দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে জমায়েত হন। এই বিক্ষোভ সভা থেকে ডাঃ ভাস্কর ভদ্রের নেতৃত্বে প্রণতি ভট্টাচার্য, অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য ও ডাঃ অসীম নন্দী এই ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পিপিপি (প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ) চালু করা, ২০০৫ সাল থেকে সাপে ও কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ না করা, ব্লক হাসপাতালগুলিকে নার্সিং হোম বানানোর প্রচেষ্টা সহ সরকারি তহবিলে তৈরি সমগ্র স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারি মালিকদের হাতে মুনাফা লোটার উদ্দেশ্যে তুলে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। জেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের দাবি জানানো হয় এবং হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প বসানো ও সরকারি নানা কাজে হাসপাতালগুলিকে ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। বিক্ষোভসভায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর আক্রমণের বিভিন্ন দিক তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন — অলোক বসু, শ্যামাপদ পরামাণিক, অনিল বাউরী প্রমুখ। ডেপুটেশন শেষে সদর হাসপাতাল মোড়ে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

দিল্লিতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কনভেনশন

সারা ভারত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ডাকে গত ১৮ ডিসেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কনভেনশন। আই এম এ হলে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে দিল্লি ছাড়া পার্শ্ববর্তী উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কে সম্ভাব্য অষ্টম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি যা গোলামির দস্তাবেজ হিসাবে চিহ্নিত হতে চলেছে এবং ডিপ্লয়মেন্ট, আউটসোর্সিং, কোর ব্যাঙ্কিং, মার্জার ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা বন্ধের বিরুদ্ধে এই কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিজয় পাল সিং। প্রস্তাবের সমর্থনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ব্যর্থতার সুযোগে এদেশে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যে মারাত্মক অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার ধারাবাহিকতায় ব্যাঙ্কশিল্পের সংস্কারের নামে কর্মচারীদের উপর নেমে আসা আক্রমণের বিভিন্ন দিকগুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। তিনি এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সংগ্রামকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে বলেন — এ সংগ্রাম এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক যা অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করে। ফোরামের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এম সি ত্যাগী তাঁর আবেগদীপ্ত ভাষণে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তথা আই বি এ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে দেশব্যাপী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উপযুক্ত ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ লড়াই শুধু আই বি এ বা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নয়, তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকর করতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ভেতর থেকে সাহায্য করছে, লড়াই তাদের বিরুদ্ধেও। সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী রাজেশ ত্যাগী এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রভাত রায় এই আন্দোলনের প্রয়োজনের দিকটি তুলে ধরে বাইরে থেকে এই আন্দোলনকে সবরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডলও বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন পরিচালনা করেন ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড ভেদরাম সিং।

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম বর্ষ

কলকাতার বুকে বিশাল, দৃপ্ত ছাত্রমিছিল

শহীদ মিনার ময়দানে শুধু ছাত্রদের সমাবেশ এবং কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ বিগত কয়েক দশকের ইতিহাসে কলকাতা মহানগরী প্রত্যক্ষ করেনি। গত ২৮ ডিসেম্বর শহীদ মিনার ময়দানে ছিল ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশ। ভারতবর্ষের ২১টি রাজ্য থেকে চল্লিশ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিল। একদা অতি ক্ষুদ্র একটি ছাত্র সংগঠন কীভাবে কেবল পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সমগ্র ভারতের ছাত্রসমাজের একমাত্র লড়াকু সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, ২৮ ডিসেম্বরের কলকাতা তার সাক্ষী হয়ে রইল। এই কলকাতাই সাক্ষী হয়েছিল গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার। ৫০ বছর পূর্ণ করে সেই সংগঠন আজ সমগ্র দেশের ছাত্র আন্দোলনের দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই সংবাদমাধ্যমের মালিকরা সতর্ক ছিল যাতে উদীয়মান সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনের বার্তাবাহী এই বিশাল ছাত্র মিছিল ও সমাবেশের সংবাদ ব্যাপক জনসাধারণের কাছে না পৌঁছায়। তাই পরদিনের সংবাদপত্র ছিল এই সমাবেশ সম্পর্কে প্রায় নীরব। তাদের ভয় — সামান্য প্রচার না দেওয়া সত্ত্বেও যেভাবে এই ছাত্র সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ল, ভারতের রাজ্যে রাজ্যে ছাত্রদের মাঝে পৌঁছে গেল, তাকে প্রচার দিলে সর্বনাশ। কারণ, এ আই ডি এস ও'র শক্তিবৃদ্ধি নিছক কোন ভোটের পার্টির শক্তিবৃদ্ধি নয়, এ হল সকল রঙের সরকারের শিক্ষাবিরোধী, ছাত্রস্বার্থবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি। কিন্তু প্রচারমাধ্যমের নীরবতা এ আই ডি এস ও'র অগ্রগতিকে রুখতে পারেনি, পারবেও না।

কীসের প্রেরণায় পাঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লি, কেরল, প্রভৃতি দূরবর্তী রাজ্যগুলি থেকে ট্রেনের জেনারেল কম্পার্টমেন্টে গাদাগাদি করে ছাত্ররা কলকাতায় এসেছিল ! ঘুমোনোর জায়গা নেই, খাওয়ার সংকট, পথের ক্লেশ সবকিছু উপেক্ষা করে তারা এই সমাবেশে হাজির হয়েছিল নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে, এসেছিল যাতে বর্তমানের সংগ্রামকে আরও বেগবান করা যায় তার জন্য যাঁরা একদিন সমস্ত প্রতিকূলতাকে অসমসাহসিক বৈপ্লবিক ঔদ্ধত্য নিয়ে মোকাবিলা করে ডি এস ও'র গোড়াপত্তন করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রামের ইতিহাস জানতে। এই সমাবেশ তাই ছিল সংগ্রামের বিদ্যাপীঠ।

মিছিল শুরু হয়েছিল কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে। সকাল থেকেই একের পর এক ছোট বড় মিছিল এসে কলেজ স্কোয়ারে জমা হয়েছে, বেলা বাড়তেই কলেজ স্কোয়ার ছাপিয়ে ছাত্রদের ভিড় গোটা এলাকায় ছড়িয়ে যায়। ছাত্রদের দাবি — ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এই দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণী পুঁজিবাদের স্বার্থে আজও এই দাবি পূরণ করেনি শুধু তাই নয়, শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে দিচ্ছে, স্কুলে-কলেজে ব্যাপকভাবে ফি বৃদ্ধি হচ্ছে, ডোনেশন-ক্যাপিটেশন চালু হচ্ছে, শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকার পুরোপুরি ছাত্র-অভিভাবকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র সফল হলে ছাত্রদের থাকবে না পড়াশুনার গণতান্ত্রিক অধিকার, শিক্ষা এবং চাকরি কুক্ষিগত হয়ে যাবে পুরোপুরি বিত্তবানদের হাতে। তাই ছাত্রসমাজ আজ শঙ্কিত। এস এফ আই, ছাত্রপরিষদ, এবিভিপি প্রভৃতি সংগঠনগুলি কেন্দ্রে, রাজ্যে শাসকদলের অনুগত থেকেছে, শিক্ষার স্বার্থে লড়াইয়ে এগিয়ে আসেনি। লড়াইয়ের ময়দানে ছাত্রসমাজ সর্বদা ডি এস ও'কেই দেখতে পায়। ডি এস ও'ই তাদের আপনজন। তাই এম এল এ, এম পি'র ব্যাকিং আছে কিনা, প্রশাসনের প্রশ্রয় আছে কিনা, এসব না ভেবে ছাত্রসমাজ ডি এস ও'র ঝাণ্ডাই তুলে ধরছে। কেন শিক্ষাক্ষেত্রে এই সংকট এবং কীসে এর সমাধান তার যে সঠিক পথনির্দেশ মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ ডি এস ও'র সামনে রেখেছেন, তাকে হাতিয়ার করে ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং উন্নত আদর্শের চর্চায় ডি এস ও কর্মীদের অপেক্ষাকৃত উন্নত চারিত্রিক মান ছাত্রসমাজকে আকর্ষণ করছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই সমাবেশে সামিল হয়েছে এই টানেই।

বেলা ১টায় বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদান করেই মিছিল রওনা হয় শহীদ মিনারের দিকে। মাল্যদান করেন ডি এস ও'র বিগত দিনের নেতৃবৃন্দ। মিছিলের পুরোভাগে ছিল সংগ্রাম-ঐক্য-প্রগতির পতাকা সহ বিভিন্ন দাবিতে সুসজ্জিত ট্যাবলো। ছিল ৫০ বছরের স্মারক ৫০টি রক্তপতাকা বহনকারী ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক। তার পিছনে ছিল ব্যান্ড বাদক দল। ড্রামের তালে তালে পা মিলিয়ে চলছিল মিছিল। বিগত দিনের ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সামনে রেখে মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল। সামনে একটি উজ্জ্বল ব্যানারে লেখা 'আমাদের পূর্বসূরিরা যাঁরা সংগ্রামের পতাকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।' সেই ব্যানার বহন করেই ডি এস ও'র সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। মিছিলে এর পরে রয়েছেন ডি এস ও সর্বভারতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। তারপর একের পর এক রাজ্যের ডি এস ও কমিটির ব্যানার হাতে ছাত্রছাত্রীরা। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সামনে মিছিল থামল। '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন ও '৯০ সালের ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের শহীদদের স্মরণবেদীতে মাল্যদান করলেন ডি এস ও'র পূর্বতন নেতারা। হিন্দি, ওড়িয়া, তেলেগু, তামিল, পাঞ্জাবী, মালয়ালম, কন্নড়, মারাঠী, অসমীয়া, উর্দু, গুজরাটি, বাংলা ভাষায় উচ্চারিত স্লোগানে নির্মলচন্দ্র সেন স্ট্রীট, এস এন ব্যানার্জী রোড তখন সচকিত ! ছাত্রমিছিলের তারুণ্য ও তেজে উজ্জ্বল চারদিক। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের ভূলুণ্ঠিত পতাকা যেন এই মিছিলের মধ্য দিয়ে পুনরুত্থানের বার্তা ঘোষণা করছিল। পথপার্শ্বের মানুষজন, যাঁরা মিছিলের চেহারা ও চরিত্র দেখে আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, একের পর এক রাজ্যের ছাত্রদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসার দৃশ্য তাঁদের অনেককে পথেই আটকে দিল। সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রীর মিছিল, অথচ শৃঙ্খলায় কোথাও সামান্য ভাঙন নেই, এ দৃশ্য বহু মানুষকে অভিভূত করেছে। এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ধর্মতলায় বাস থেকে নেমে এলেন শুধু একথা জানতে যে, এত সুশৃঙ্খল বিশাল মিছিলের সংগঠক কারা। তাদের অনেকের চোখে-মুখেই অস্ফুট অভিব্যক্তি — এস ইউ সি আই-এর ছাত্র সংগঠন এত বিরাট হয়ে গেছে, ভারতের সব রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে! অপেক্ষমান অনেকে ভেবেছেন এই বুঝি মিছিলের শেষ দেখা যাবে। কিন্তু না, এ যেন ছাত্রদের এক অন্তহীন স্রোত। মিছিলে এসেছে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডিগড়, পাঞ্জাব, রাজস্থানের ছাত্রছাত্রীরা। পতাকা হাতে এগিয়েছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ুর ছাত্ররা। শেষোক্ত তিন দক্ষিণী রাজ্যের বহু ডি এস ও কর্মীই আসতে পারেননি, নিজ নিজ রাজ্যে সুনামি বিধ্বস্ত জনগণের ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রিয় সংগঠনের ৫০ বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার প্রবল আগ্রহ ও আকর্ষণকে তারা সংবরণ করেছেন। এটাও এ আই ডি এস ও'র আদর্শ। মিছিলে যোগ দিয়েছে ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, সিকিম, আসাম ও ত্রিপুরার ছাত্ররা। আর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। মিছিল রানি রাসমণি রোডে পৌঁছালে, সেখানে স্থাপিত, ১৯৯০ সালের ভাড়াবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের শহীদ মাধাই হালদারের শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানালেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ। এরপর মিছিল শহীদ মিনারকে ডাইনে রেখে এগিয়ে গেল, মেয়ো রোড দিয়ে প্রবেশ করল ময়দানে।

চারের পাতায় দেখুন

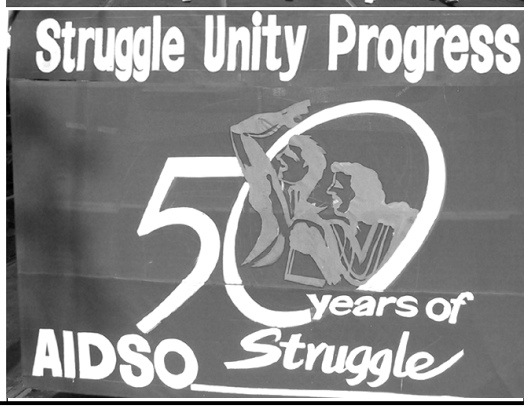

এ আই ডি এস ও'র ৫০ বর্ষ

কলকাতার বুকে বিশাল দৃপ্ত ছাত্রমিছিল

তিনের পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রান্তে সুউচ্চ শহীদ মিনারকে মঞ্চের পিছনে রেখে, পূব থেকে পশ্চিমে নির্মিত হয়েছিল সুদৃশ্য মঞ্চটি। মঞ্চের ঠিক সামনেই বসার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল এ আই ডি এস ও'র পূর্বতন সদস্যদের জন্য। ক্রমে ক্রমে সেই আসনগুলি ভর্তি হয়ে গেল। সংগঠনের ৫০ বর্ষ পূর্তি বহুজনকেই অনেককাল পরে একে অপরকে দেখার ও কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে। যেজন্য অপরিসীম আনন্দের অভিব্যক্তি পূর্বতনদের চোখেমুখে।

মিছিল মেয়ো রোড প্রান্ত দিয়ে ময়দানে প্রবেশ করছে, ছাত্ররা নির্দেশমতো যে যার জায়গা নিয়ে বসে পড়ছে। মিছিলের যেন শেষ নেই। ফলে সভার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তবুও সভা শুরু করতে পারছেন না সংগঠকরা। বিকাল ৩টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও মিছিল শেষ হল না দেখে, সংগঠকরা বাধ্য হলেন সভা শুরু করতে।

সভার শুরুতেই দেশ-বিদেশের গণসংগ্রামে নিহত শহীদদের স্মরণে নির্মিত বেদীতে মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানালেন এ আই ডি এস ও'র উপদেষ্টা, এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং এ আই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠাপর্বের সংগঠক, বর্তমানে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। এ আই ডি এস ও'র বর্তমান সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামলও মাল্যদান করেন।

এরপর ২৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভূমিকম্প ও সুনামিতে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুতে গভীর বেদনা প্রকাশ করে একটি শোকপ্রস্তাব পড়ে শোনান এ আই ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায়। চল্লিশ হাজার ছাত্রছাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে, নিহতদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করে। ৪ জানুয়ারীকে সর্বভারতীয় ত্রাণ সংগ্রহ দিবস হিসাবে ঘোষণা করে ঐদিন সর্বত্র ছাত্রকর্মীদের ত্রাণ সংগ্রহে অংশ নিতে আহ্বান জানানো হয়।

৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এ আই ডি এস ও'র দু'টি বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য — একটি হচ্ছে মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের তিনটি রচনা সম্বলিত ''প্রবেলমস্ অফ এডুকেশন এ্যান্ড স্টুডেন্টস্ মুভমেন্ট'', অপরটি হচ্ছে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর রচনা 'সাম অ্যাসপেক্টস্ অফ স্টুডেন্টস্ মুভমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশন।' এই দুটি বইসহ কমরেড শিবদাস ঘোষের অন্যান্য রচনা ও নির্বাচিত রচনাবলী কেনার জন্য বুকস্টলে দেখা গেল উপচে পড়া ভীড়। ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার এই প্রবল আগ্রহ সত্যই প্রেরণাদায়ক।

এরপর নেপালের ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি কমরেড জীবন গৌতম বক্তব্য রাখেন। ৫০ বর্ষ পূর্তিতে এ আই ডি এস ও'কে তিনি অল নেপাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস্-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। তিনি জানান, নেপালের ছাত্রসমাজ কীভাবে একদিকে রাজার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে বুর্জোয়া শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আন্দোলন চালাচ্ছে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে। তিনি বলেন, নেপালের জনগণ ও ছাত্রদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেমন নেপালের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করছে, তেমনই প্রতিবেশী ভারতের শাসকশ্রেণীও সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য থেকে রাজাকে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামী জনগণ ও ছাত্রসমাজ নিশ্চয়ই প্রতিবাদে সোচ্চার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেপালি জনগণও অংশগ্রহণ করেছিল; শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেপাল ও ভারতের জনগণের মৈত্রী কখনও নষ্ট হতে পারেনা।

প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও জনগণের সম্পত্তির বিপুল ধ্বংসের গভীর ব্যথা নিয়েই আমরা সকলে এই সভায় এসেছি। এ আই ডি এস ও'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি সক্রিয় কর্মী, সংগঠনের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী সর্বশক্তি দিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করবেন, যেমন তাঁরা ইতিপূর্বে ওড়িশার সাইক্লোন, গুজরাটের ভূমিকম্পে এবং আসাম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বন্যায় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর আগে ১৯৫৪ সালে আমরা কলকাতায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্র যে সংগঠনের সূচনা করেছিলাম, আজ সেই সংগঠনের ৫০ বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন সমাবেশে দেশের ২১টি রাজ্য থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছেন। আমাদের এই সংগঠনের পিছনে কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছিলনা, কোন সরকারি দলের, কিংবা এম এল এ-এম পি'র ব্যাকিং ছিল না, সংবাদপত্রের ব্যাকিং ছিলনা, তবুও এই ছাত্র সংগঠন ৫০ বছর পার করে আজ তীব্র রাজনৈতিক হতাশার যুগে এত বিরাট শক্তিশালী রূপ নিতে পারল কিসের জোরে? সংখ্যায় আমরা অল্প ছিলাম ঠিক, কিন্তু আমরা বলীয়ান ছিলাম আদর্শের শক্তিতে — যে শক্তির উৎস মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। এদেশে নবজাগরণের সকল মনীষীদের ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লববাদী ধারার সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। পূর্বসূরীদের অপূর্ণ স্বপ্ন সফল করার জন্য তিনি এযুগের শ্রেষ্ঠ মতবাদ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে এদেশে যে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, সেই আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে তাঁরই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেদিন যাঁরা স্কুল-কলেজে ঘুরে ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই

সাতের পাতায় দেখুন

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম বর্ষপূর্তিতে

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর বার্তা

বন্ধুগণ,

২৮ ডিসেম্বর ২০০৪, এ আই ডি এস ও'র ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্ত থেকে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা কলকাতায় সমবেত হয়েছেন তাঁদের প্রিয় সংগঠনের ৫০ বছরের সংগ্রামের তাৎপর্যকে যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য। তাঁদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন কীসের জন্য আজ শিক্ষা-সংস্কৃতি-নৈতিকতার এই গভীর সঙ্কট। কেন শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী শিক্ষাকে সার্বজনীন করার পরিবর্তে সঙ্কুচিত করছে। কী সেই কারণ, যে জন্য তারা শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করছে, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটাচ্ছে। কেন তারা প্রথাগত শিক্ষাকে গৌণ করে দূরায়ত্ত শিক্ষা, পত্রযোগে শিক্ষা বা প্রাথমিক স্তরে ডি পি ই পি'র মতো শিক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে। কেন প্রথাগত শিক্ষায় ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার তৈরি করাই ছাত্রজীবনের মূল লক্ষ্য ও সাধনা বলে জোরের সাথে প্রচার করে ছাত্রদের সমাজবিমুখ, আত্মসর্বস্ব, মনুষ্যত্ব-বিবেকরহিত হীন চরিত্রের করে গড়ে তুলতে চাইছে। কেন আজ ছাত্রজীবনের শেষে সাধারণ ছাত্রদের চোখের সামনে ঘোর অন্ধকার এবং গভীর হতাশা যা তাদের বিপথে পরিচালিত করছে, এমনকী অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করছে।

এইসব প্রশ্নের ইতিহাসসম্মত, বাস্তবভিত্তিক এবং সঠিক বিজ্ঞানসম্মত উত্তর পেতে হলে ছাত্রদের প্রথমেই বুঝতে হবে, কেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এ আই ডি এস ও বিজ্ঞানভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষার মূল দাবি নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেছিল। এই তিনটি দাবির যথাযথ উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত আছে শিক্ষাক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর ক্রমাগত ভয়াবহ আক্রমণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে চিনে নেওয়ার মূল সূত্র। আজ এই জরাগ্রস্ত অবক্ষয়ী শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেই শাসকশ্রেণী শিক্ষাকে চার দেওয়ালের গণ্ডিতে আটকে ফেলে ছাত্রদের সমাজবিমুখ, যান্ত্রিক মননের অধিকারী এবং সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় কলুষিত ও 'লারেলাপ্পা' কালচারের বাতাবরণে হীনবল করতে চাইছে, যাতে তারা গণআন্দোলনের পথে পা বাড়াতে না পারে। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রবল আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তোলার মহান দায়িত্ব এ আই ডি এস ও-কেই নিতে হবে।

আজ সমাজজীবনে যেসব জ্বলন্ত সমস্যার মুখোমুখি প্রতিদিন হতে হচ্ছে ছাত্র সহ শ্রমিক, ক্ষুদ্র বা মধ্যচাষী, খেতমজুর এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষকে, তা উৎসারিত হচ্ছে মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত উৎপাদনব্যবস্থা থেকে। মনে রাখতে হবে, এই শোষণ-নির্যাতনকারী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে যে মূল দ্বন্দ্ব বা বিরোধ তাকে ঘিরেই সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে। তাই আজ সভ্যতার বিকাশ এবং ছাত্রসমাজ সহ সমস্ত মেহনতি মানুষের মুক্তির প্রশ্নটি সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আজ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে ছাত্রদের যেগুলি মূল সমস্যা, তার সমাধান শুধুমাত্র ছাত্রআন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সম্ভব হবে না। ছাত্রআন্দোলনকে আজ সর্বহারাশ্রেণীর উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে গড়ে তুলতে হবে, যা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সহায়করূপেই কাজ করবে। এই পথেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একটা সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে উঠবে।

সামাজিক আন্দোলনে, বিশেষ করে সমাজের আমূল পরিবর্তনে সমস্ত যুগে যে ভূমিকা নেওয়ার দায়িত্ব ছাত্রদের ওপর ঐতিহাসিকভাবে বর্তেছে, তাকে আজ পালন করতে হলে একদিকে প্রচলিত সমাজ-মানসিকতা, ক্যারিয়ারিজম, হীন ব্যক্তিবাদ, স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের যেমন সাহসের সাথে মাথা উঁচু করে লড়তে হবে, তেমনি এই লড়াইকে তার সঠিক লক্ষ্যে ও পরিণতিতে পৌঁছে দিতে হলে মহান কমিউনিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তা করতে হবে। এর জন্য ছাত্র আন্দোলনকেও 'স্কুল অব কমিউনিজম'-এ রূপান্তরিত করতে হবে। এই পথেই ছাত্রদের মধ্য থেকে একদল শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবীর (declassed intelligentsia) জন্ম হবে — যারা দায়িত্ববোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নত রুচি-সংস্কৃতির মান, মধুর ব্যবহার আর প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণের দ্বারা কেবল ছাত্রসমাজকেই নয়, সমগ্র শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামকেই উদ্বুদ্ধ করবে, প্রাণসঞ্চার করবে, অগ্রগামী (vanguard) ভূমিকা পালন করবে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ আই ডি এস ও আজকের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে, তার ওপর ইতিহাসন্যস্ত দায়িত্ব ও ভূমিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে —যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ-নির্যাতনের অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

ইউক্রেনে সঙ্কট

সাম্রাজ্যবাদ থাবা বিস্তার করছে পূর্বদিকে

২৬ ডিসেম্বর পুনরায় অনুষ্ঠিত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী ভিক্টর ইউশচেঙ্কো জয়ী হয়েছেন। ইতিপূর্বে ২১ নভেম্বর প্রথমবার যে নির্বাচন হয়, তাতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইয়ানুকোভিচ জয়ী হয়েছিলেন। ঐ নির্বাচনের ফল বেরোতেই বিরোধী পক্ষ থেকে নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ তোলা হয়, তুমুল সোরগোল ওঠে। শেষপর্যন্ত ঐ নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে সরকার। ২৬ ডিসেম্বর সেই দ্বিতীয় দফার নির্বাচন হয়েছে। এবারের নির্বাচন নিয়ে পরাজিত প্রার্থী ইয়ানুকোভিচ অভিযোগ করে বলেছেন, ''বহু ভোটারকে ভোট দিতেই দেওয়া হয়নি''। ২১ ডিসেম্বরের নির্বাচনকে ঘিরে মার্কিন শাসকরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। আমেরিকার তদানীন্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট কলিন পাওয়েল বলেছিলেন, ''এই নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'' পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে বর্তমান নির্বাচন যদি সত্যই উন্নত মানের হত, তবে ২০০০ সালে জর্জ বুশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না, ২০০৪ সালে ওহিও এবং অন্যান্য বহু প্রদেশে জিততেও পারতেন না।

ফলে নির্বাচনে জালিয়াতি নিয়ে ইউক্রেনে রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়নি। ইউক্রেনের রাজনৈতিক সঙ্কটের পিছনে আছে মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা। তারাই ইউক্রেনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে এবং সেদেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করছে।

অবস্থানজনিত কারণে ইউক্রেন সামরিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নানা সম্পদে ভরপুর। সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য হল এই সম্পদ লুঠ করতে মার্কিন এবং ইউরোপীয় বৃহৎ পুঁজিপতি সংস্থাগুলি যাতে বাঁধভাঙা বন্যার মতো ইউক্রেনে প্রবেশ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। তাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হল, ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধন ভেঙে দিয়ে রাশিয়াকে দুর্বল করে দেওয়া এবং তৃতীয় লক্ষ্য, ইউক্রেনকে দ্রুত 'ন্যাটো' (NATO) জোটের আওতায় নিয়ে আসা।

রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে খুঁটিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, ইউক্রেনের এই নির্বাচন নিয়ে বিরোধ আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রমাগত পূর্বদিকে সম্প্রসারণ এবং রাশিয়াকে ঘিরে ফেলে সেদেশকে নয়া উপনিবেশে পরিণত করার পরিকল্পনা থেকেই দেখা দিয়েছে। এই হিংসাত্মক, আগ্রাসী এবং ভয়ঙ্কর অভিযানের যারা হোতা, তাদের হাত বুশ ও তার প্রশাসন ছাড়িয়ে প্রসারিত ; প্রকৃতপক্ষে এই নাশকতামূলক কার্যকলাপে যারা যুক্ত তাদের নামের তালিকা দেখলে এমন বহু বৃহৎ পুঁজিপতি ও তাদের সংগঠনের নাম পাওয়া যায় যাদের অনেকেই বুশ ও তার হঠকারী বিদেশনীতির বিরোধী ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'কার্নেগি ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস', জর্জ সোরোসের 'ওপেন ইন্সটিটিউট', 'ফ্রিডম হাউস' এবং 'ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্র্যাসি' ইত্যাদি সংস্থাগুলি। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের নাশকতামূলক সংস্থাগুলোর নামও এই তালিকায় যুক্ত হবে।

এরা 'পি ও আর এ' (PORA) নামে একটি তথাকথিত ছাত্র সংগঠন তৈরি করেছে। এরা হাজার হাজার নির্বাচন পরিদর্শক, বিক্ষোভকারী এবং প্রচারক নিযুক্ত করেছে। যেমন সার্বিয়ায় 'ওইপর' এবং জর্জিয়ায় 'কামারা' নামে তৈরি করা হয়েছিল। 'এক্সিট পোল'-এর ব্যবস্থা করে এরাই নিজেদের পছন্দের প্রার্থী ভিক্টর ইয়ুশচেঙ্কো ১১ শতাংশ বেশি ভোট পাবেন বলে প্রচার করেছে। প্রচারমাধ্যম সেইসময় এই বিষয়টিকেই বেছে নিয়ে প্রচারের ঝড় তুলে দিয়েছিল। এরাই ইয়ুশচেঙ্কোর নির্বাচনী প্রচার সংগঠিত করা থেকে স্লোগান, লোগো ইত্যাদি ঠিক করে দেওয়া প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করেছে।

ইয়ুশচেঙ্কোর নিজস্ব 'আমাদের ইউক্রেন' আন্দোলন ও কিয়েভ প্রেস ক্লাব অর্থসাহায্য পায় ওয়াশিংটনের 'ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্র্যাসি'র কাছ থেকে। এই 'ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্র্যাসি' আবার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সি আই এ'-এর মদতপুষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার 'নরমপন্থীরা' জর্জ বুশকে বলছে — দেখ, ইরাকে তোমার হঠকারিতার কী বিরাট মাশুল আমাদের দিতে হচ্ছে, আমরা কীরকম ফাঁদে পড়েছি। আমরা তোমায় দেখিয়ে দেব, কী করে ধনসম্পদে ঐশ্বর্যশালী ৫ কোটি মানুষের একটা দেশকে ঠাণ্ডা মাথায় দখল করে নিতে হয়। এদেরই মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছিলেন কলিন পাওয়েল। বুশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাওয়েলই ইউক্রেনকে দেখভাল করছিলেন।

পূর্বদিকে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ

পোল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক সরকারকে সি আই এ'র দ্বারা উৎখাত করার মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদের পূর্বদিকে অভিযান শুরু হয়েছিল। এজন্যই হাতের পুতুল লেচ ওয়ালেসাকে সামনে এনে সি আই এ 'সলিডারিটি আন্দোলন' শুরু করেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের মধ্য দিয়ে এই অভিযান চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। এরপর ১৯৯৯ সালে যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধ এবং অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্লোবোদান মিলোসেভিচ সরকারের পতন ঘটিয়ে সার্বিয়া দখল করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এরপর ওয়াশিংটন জর্জিয়া থেকে তার একসময়কার মিত্র এডুয়ার্ড শেভার্দনাদজেকে হঠিয়ে সেখানে নিজেদের হাতের পুতুল মিখাইল শাকাসভিলিকে বসায়। তবে বেলারুশের সরকারকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হঠাতে পারেনি। অবশেষে তারা এখন ইউক্রেন দখলের পথে।

ইউক্রেনের সীমানা বরাবর রয়েছে রাশিয়া, বেলারুশ, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, মলডোভা, রোমানিয়া, কৃষ্ণসাগর এবং আভভ সাগর। এদেশের জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। জারের সাম্রাজ্যে ইউক্রেন ছিল একটি উপনিবেশ। এই দেশটির পূর্বাংশ বলশেভিক বিপ্লবের পর এক গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ইউক্রেনিয় সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক হিসাবে গড়ে ওঠে। পরে ১৯২২ সালে গঠিত মূল সোভিয়েট ইউনিয়নের অংশে পরিণত হয়।

অন্যদিকে পশ্চিম ইউক্রেন ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পুঁজিবাদী পোল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করার মূল পরিকল্পনার অংশ হিসাবে হিটলারের নাৎসি সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিম ইউক্রেন আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। নাৎসিদের হাতে সেইসময় এখানকার ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। শুরুতেই নাৎসিরা লালফৌজের বেশ কয়েকটি ইউনিট ধ্বংস করার পর তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইউক্রেনকে একটি পিছিয়ে-পড়া কৃষি ও খনিপ্রধান অঞ্চল থেকে একটি বৃহৎ শিল্পশক্তিতে রূপান্তরিত করে। শিল্পে ইউক্রেন এত উন্নত করে যে তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নে রাশিয়ার পরেই দ্বিতীয় স্থানে ছিল ইউক্রেন। পরিকল্পিত অর্থনীতির জোরেই ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপুল ধ্বংসের ধাক্কা সামাল দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন এবং সেখানে পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের পর ইউক্রেনের নতুন বুর্জোয়া শাসকরা সেদেশকে 'স্বাধীন' বলে ঘোষণা করে এবং ক্রমাগত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তুলতে থাকে। উৎপাদন আগের তুলনায় অর্ধেক হয়ে যায় এবং ৩০ শতাংশের বেশি মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে। আগে সেদেশের নাগরিকরা যেসব সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলি পেত, সেগুলোও ধীরে ধীরে কমানো হতে থাকে এবং সোভিয়েটের পতনের পর পুঁজিবাদের খপ্পরে পড়া অন্য দেশগুলির মতোই ইউক্রেনও কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে চরম অনিশ্চয়তায় ভরা একটি দেশে পরিণত হয়।

আবার এই ইউক্রেনের ওপরেই বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রবল লোভ রয়েছে। একটি ইন্টারনেট সংবাদসংস্থা ইউক্রেনের যে বর্ণনা দিয়েছে, তা লক্ষ্য করার মতো। তাতে বলা হয়েছে, ''প্রাকৃতিক সম্পদ, উন্নত কৃষি জমি এবং শিক্ষিত জনগণ সমৃদ্ধ এই দেশটি তার বিশেষ অবস্থানের দরুন পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট দেশগুলির অন্যতম। এই বিদেশি পুঁজি ইউক্রেনের পুনর্গঠনের কাজেই প্রয়োজন।''

সেখানে আরো বলা হয়েছে, ''ইউক্রেন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে লৌহ, কোক, খনিজ সার এবং রাসায়নিক শিল্প। এদেশে এরোপ্লেন, টার্বাইন, ধাতব যন্ত্রপাতি, ডিজেল ইঞ্জিন এবং ট্রাক্টর তৈরির কারখানা আছে। এখানে নানা ধরনের শস্য, সূর্যমুখীর বীজ এবং চিনি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশ এবং রকেট শিল্পও এখানে গড়ে উঠেছিল। ইউক্রেনের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ না হলেও কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ এদেশে প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশ্বে যেসব দেশের ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে তেল ও গ্যাস পরিবাহিত হয়, ইউক্রেন তাদের অন্যতম প্রধান। রাশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের তেল ও গ্যাস ইউক্রেনের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।''

ইউক্রেনের এই বর্ণনায় স্টকহোল্ডার, ওয়াল স্ট্রিট, শেয়ার বাজারের দালাল, বিভিন্ন কোম্পানির কর্তাব্যক্তি এবং ব্যাঙ্কারসহ সারা বিশ্বের মুনাফাখোর পরগাছাদের জিভে জল আসারই কথা। কারণ, সমাজতন্ত্রের যুগে বছরের পর বছর ধরে শ্রমজীবীরা যে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোগুলি তৈরি করেছিল, তা আজ যেন এইসব মুনাফাবাজদের লুঠের অপেক্ষাতেই পড়ে আছে।

কিন্তু ইউক্রেনের তথাকথিত 'শাসকগোষ্ঠী' (Oligarchs) এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্রুত সহযোগিতা করছে না। দেশের সকল সম্পদ তারা নিজেরাই লুটেপুটে খেতে চায় এবং এটাই হচ্ছে ইউক্রেনের বর্তমান সঙ্কটের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এই 'অলিগার্ক' শাসকগোষ্ঠী বলতে সেই সমস্ত লুঠেরা-পুঁজিপতিদের বোঝানো হচ্ছে, যারা তাদের রাজনৈতিক যোগাযোগগুলিকে ব্যবহার করে বেআইনিভাবে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশের সম্পত্তিগুলি নেহাতই কম দামে গ্রাস করছে। এদের নিন্দাতেই বুর্জোয়া প্রেস 'অলিগার্ক' শব্দটি ব্যবহার করছে এবং শব্দটি খুব জুতসই। তবে সিটিব্যাঙ্ক, জে পি মর্গান চেস, গোল্ডম্যান স্যাচ্স এবং ফরচুন ৫০০-এর মতো পুঁজিবাদী সংস্থাগুলি সম্পর্কেই এই শব্দটি অধিকতর প্রযোজ্য, যারা দেশের সম্পদ আত্মসাৎ করতে শুধু রাজনৈতিক যোগাযোগগুলিকেই ব্যবহার করে না, সি আই এ এবং পেন্টাগনকেও কাজে লাগায়।

সাম্রাজ্যবাদ বনাম দেশীয় পুঁজিপতি

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ইউক্রেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ইয়ুশচেঙ্কোর প্রবল দ্বন্দ্বের বিষয়টি শুধুমাত্র সেদেশের ভিতরকার ব্যাপার নয়। বৃহৎ পুঁজিপতি পরিচালিত প্রচারমাধ্যম এই দ্বন্দ্বটিকে দেখানোর চেষ্টা করছে গণতন্ত্র ও দুর্নীতির দ্বন্দ্ব হিসাবে এবং জাতীয়তাবাদী পশ্চিম ইউক্রেন বনাম রুশভাষী পূর্ব ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব হিসাবে। কিন্তু আসলে ইউক্রেনে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের পটভূমিতেই এই দ্বন্দ্বকে বোঝা সম্ভব।

ইউক্রেনের সংরক্ষণবাদী প্রতিবিপ্লবী জাতীয় পুঁজিপতিদের একটি অংশ বেসরকারীকরণ নীতির সাহায্যে নিজেদের পেট মোটা করে এখন গোটা শিল্পসাম্রাজ্যকে গ্রাস করতে চায়। সমাজতান্ত্রিক ইউক্রেনের শ্রমিক-কৃষকরা ৭০ বছর ধরে যে সম্পদ তিলে তিলে গড়ে তুলেছে, এইসব দেশি পুঁজিমালিকরা এখন সেগুলি গোগ্রাসে গিলে নিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। আবার এদের শক্তির, এমনকী একেবারে কোমর ভেঙে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিট, লন্ডন, প্যারিস, রোম এবং ব্রাসেল্সের বৃহৎ কর্পোরেটগুলো এবং রাজনৈতিক কৌশলকারীরা। এই নিয়েই দ্বন্দ্ব বেধেছে। স্বভাবতই ইউক্রেনের দেশি পুঁজির মালিকরা লুটের সম্পদ বাইরের কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে একেবারেই রাজি নয়, ফলে তারা বিদেশিদের আটকেছে।

প্রেসিডেন্ট লিওনিদ কুচমা, যাঁর দ্বিতীয় দফার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, তিনি উত্তরাধিকারী হিসাবে ইয়ানুকোভিচকে বেছে নেন। এই ইয়ানুকোভিচ ছিলেন কয়লাসমৃদ্ধ দনেৎস্ অঞ্চলের গভর্নর। পরবর্তীকালে নভেম্বর '০২ থেকে ডিসেম্বর '০৪-এ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন, ইউক্রেনের পূর্বদিকের এই শিল্প এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলটিতে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান ও বেসরকারীকরণের কারণে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দুর্গতিকে কিছুটা লাঘব করতে তিনি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করে, পেনশন এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলিকে বাড়িয়ে নিজের ভিত্তি মজবুত করেছেন।

ইয়ানুকোভিচ বড় বড় কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে যে মূল সত্যটাকে আড়াল করতে চেয়েছেন, তা হল, তিনি কুচমা গ্রুপেরই লোক, যারা পুঁজিপতিদের পকেট আরও ভরাতে সাহায্য করে এসেছে। এইসব পুঁজিপতিদের মধ্যে আছেন রিনাৎ আখমেতভ, যিনি ইউক্রেনের সর্ববৃহৎ কর্পোরেশন 'সিস্টেম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট'-এর মালিক ; আছেন, ইন্টারপাইপ ও তিনটি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক কুচমার জামাতা ভিক্টর পিনচুক — ইউক্রেনের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় যিনি দ্বিতীয় স্থানে। এছাড়াও ইয়ানুকোভিচের পেছনে আছে সেদেশের পুঁজিপতিদের আরো একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেয়ারপার্সন, যিনি ইউক্রেনের শিল্পসংস্থাগুলির প্রধান অংশটি গ্রাস করার চেষ্টা চালিয়েছেন, ইয়ানুকোভিচ তাঁরও খুবই কাছের লোক।

দুঃখের কথা, এই লড়াইয়ের মধ্যে দুই বুর্জোয়া শিবির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি স্বাধীন শ্রমিকশ্রেণীর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না। অথচ, দুই বুর্জোয়া শিবিরের মুখোশ খুলে দিয়ে, শ্রমিকের অধিকার ও পরিকল্পিত অর্থনীতির দাবিতে পুঁজিবাদের ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আবার জাগিয়ে তুলতে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব স্বাধীন ভূমিকারই এখন সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন ছিল।

১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট কুচমা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইয়ুশচেঙ্কো সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে বেসরকারীকরণের 'অগ্রগতি' ঘটান। অক্টোবর ২৯-এর রাশিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারনেট ডাইজেস্ট (আর আই আই ডি) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে — ইয়ানুকোভিচকে 'রাশিয়ার মিত্র'

আটের পাতায় দেখুন

কৃষক জীবনে ভয়াবহ দুর্দিন

সারা দেশের মতই এ রাজ্যেও কৃষকদের জীবনে এক চরম সংকট ঘনীভূত হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে চাষের আনুষঙ্গিক খরচ ক্রমাগত বাড়ছে, অথচ গরিব চাষী তার ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। চাষের খরচটুকু পর্যন্ত পোষাচ্ছে না। প্রতিটি মরশুমেই ফসল ওঠার সাথে সাথে গরিব চাষী তাঁর উৎপাদিত ফসল অভাবের দায়ে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। একে অভাবী বিক্রি বলে। অথচ সেই সময়ে কৃষিপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ফসলের দাম কমিয়ে দেয়। আবার গরিব চাষীর ঘর থেকে ফসল বেরিয়ে গেলেই বাজারে ফসলের দাম চড়চড় করে বাড়তে থাকে। সেই বাড়তি দামেই তখন চাষী সেই ফসলই কিনতে বাধ্য হন। মাঝখান থেকে এই প্রক্রিয়ায় ফড়ে, পাইকার, আড়তদার, ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়, আর লাভবান হয় কোল্ড স্টোরেজ মালিকরা, মিলমালিকরা। চাষী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই শুধু নয়, তার জীবনে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হতে থাকে।

একজন চাষী কতরকমভাবে মার খায় ! চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশকের ক্রমাগত অত্যধিক হারে দামবৃদ্ধি হচ্ছে, সময়মত এসব আবার পাওয়াও যাচ্ছে না। অন্যদিকে উন্নত মানের বীজ বেশি দাম দিয়ে কিনলেও এবং চারা ভাল হলেও দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই ফসল ভাল হচ্ছে না। এবছর সূর্যমুখী চাষ ও টমেটো চাষের ক্ষেত্রে বীজের গুণগত মান নিয়ে এ ধরনের বিস্তর অভিযোগও উঠেছে। কীটনাশকের দাম অনেক, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তার দ্বারা কীটনাশ হচ্ছে না। তাছাড়া বীজ, সার ও কীটনাশক আজ বহুজাতিক কোম্পানির অধীনে। তারাই ইচ্ছামত দাম বাড়াচ্ছে। জৈব প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বীজের গঠন এমনভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে যে, চাষের জন্য যে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার আবশ্যিক, তা বহুজাতিকদের কাছ থেকেই কিনতে হবে। এখানে চাষীর স্বনির্ভরশীলতা নেই। ক্রমে ক্রমে সাবেকী চাষপ্রথা সুকৌশলে ভেঙে দিয়ে চাষীকে বহুজাতিকের উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছে। চাষী এই সমস্ত বহুজাতিকের নির্মম শোষণের শিকার হচ্ছে।

চাষের জন্য দরকার প্রচুর জলসেচ। সেক্ষেত্রে ডিজেল ও বিদ্যুতের ক্রমাগত দামবৃদ্ধিতে সেচের খরচ বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। অন্যদিকে খরায়, বন্যায়, শিলাবৃষ্টিতে, ঘূর্ণিঝড়ে ফসল নষ্ট হচ্ছে। সরকার শিল্পপতিদের ভর্তুকি দিলেও এহেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। জমির কর, খাজনা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে সেচ না পেলেও সেচযোগ্য জমি ঘোষণা করে সেই অনুপাতে খাজনা আদায় করা হচ্ছে। চাষের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কোদাল, পাশুনি, লাঙল, ফলা, চাকা, পাম্প, ধানঝাড়াই মেশিন, ওষুধ দেওয়ার মেশিন, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, ট্রলি এসবের দামও খুব বেশি। সব মিলে চাষের খরচ ব্যাপকভাবে বাড়ছে।

এত খরচ করে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চাষী যে ফসল ফলায় তার ন্যায্য দাম পায় না। অনেক ক্ষেত্রে চাষী বাজারে যে ফসল বয়ে নিয়ে যায় তার যাওয়া আসার ভাড়া, পারিশ্রমিক কোনটাই পোষায় না ঠিকমত দাম পায় না বলে। দাম না পাওয়ার কারণে টমেটো, বাঁধাকপি, আলু ইত্যাদি অনেক সময় রাস্তায় বাজারে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। যেসব ফড়েরা বাজার থেকে চাষীর কাছ থেকে ফসল কেনে তারা সব একজোট। তারা কমদামে চাষীদের ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করে। ফড়েদের কবল থেকে চাষীদের বাঁচানোর জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই। অভাবী বিক্রির হাত থেকে চাষীদের বাঁচানোর কোন সুব্যবস্থা নেই। সরকার প্রতিবছর ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করলেও এবং ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করলেও কতজন চাষী সরকারি ধার্যমূল্যে ধান বিক্রয় করতে পারে, গ্রাম পিছু দু'চারজন ছাড়া? তাও সরকারি দলের সার্টিফিকেট চাই। এদিকে সরকার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য বাজার থেকে যে ধান সংগ্রহ করে, সেই ধান কিনতেও চলে গড়িমসি। সেই সুযোগে ধানকল মালিকরা গরিব চাষীর ধান কম দামে কিনে নিয়ে সরকারের কাছে সহায়ক মূল্যে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে। এদেরই যাঁতাকলে পিষ্ট চাষীরা।

এদেশের জাতীয় কৃষিনীতি প্রসঙ্গে অতীতের কংগ্রেস বা পরবর্তীকালে বিজেপি-তৃণমূলীদের এন ডি এ জোট সরকার এবং বর্তমানে কংগ্রেস-সিপিএমের ইউ পি এ জোট সরকারের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই কৃষিনীতি কৃষকের স্বার্থে রচনা করা হয়নি, করা হয়েছে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউসগুলোর স্বার্থে, যারা কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। সেই জাতীয় কৃষিনীতিই এ রাজ্যের সিপিএম চালিত বামফ্রন্ট সরকারও অনুসরণ করে চলেছে। সিপিএম সরকার জমির সিলিং প্রথা তুলে দিয়েছে যাতে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউসগুলি বড় বড় কৃষি ফার্মিং করতে পারে। ফলে কৃষিতে দেশি-বিদেশি পুঁজির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে। সরকারি নীতিতে বাণিজ্যিক ফসলের দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত চাষ চূড়ান্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল। ফলে চাষীরা মহাজনি ঋণ, ব্যাঙ্কিং ঋণের ফাঁদে পড়ছে, সুদও বাড়ছে। ফসলের দাম না পাওয়ায় দেনার দায়ে চাষীর আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। ঋণগ্রস্ত হয়ে গরিব চাষী, নিম্নমধ্যচাষী অবশিষ্ট জমিটুকুও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। তারা আর জমি ধরে রাখতে পারছে না। মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪ দেখিয়েছে, ১৯৮৭-৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩৯.৬ শতাংশ ভূমিহীন পরিবার ছিল, যা ১৯৯৯-২০০০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯.৮ শতাংশ — অর্থাৎ গ্রামের অর্ধেক পরিবারেরই জমি নেই। পুঁজিবাদী শোষণের নির্মম পরিণতিতে আজ তারা ভূমিহীন মজুর।

কৃষি ক্ষেত্রে যেটুকু ভর্তুকি আছে আজ সেটাকেও তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভর্তুকি তুলে দেওয়ার পেছনে সরকারের টাকা নেই বলা হলেও বাস্তবে এর পেছনে রয়েছে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চাপ। তারা অন্য দেশকে ভর্তুকি তুলে দিতে বলছে, আর নিজের দেশে ভর্তুকি বহাল রাখছে। এইভাবে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিজ দেশে ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে বিদেশে কম দামে খাদ্যশস্য রপ্তানি করে সে দেশের বাজার কুক্ষিগত করছে এবং সেখানকার উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনছে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশকে তাদের উপর নির্ভরশীল করে তুলছে।

অন্যদিকে সরকার বিভিন্নরকম খাজনা, ট্যাক্স বাড়িয়েই চলেছে। এক সময় জমির খাজনা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি পর্যন্ত মকুব ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন সেই মকুব করা খাজনা বিগত দীর্ঘ ২৫ বছরের সুদেমূলে আদায়ের জন্য সিপিএম সরকার বিভিন্ন আর আইদের পুরস্কৃত করা হবে বলে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, কে বেশি আদায় করতে পারে। ফলে নোটিশ জারি করে, কোথাও কোথাও জোর করে জমির খাজনা আদায় করা হচ্ছে। এর উপর রয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ও চাষের নানারকম সরঞ্জামের উপর ট্যাক্স চাপানোর ষড়যন্ত্র। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, চাষীর ঘরে আয় বলতে কিছু নেই। অথচ খরচ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পড়াশুনার খরচ আগের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। চিকিৎসার খরচ ধরাছোঁয়ার বাইরে। অল্প একটু-আধটু জ্বর জ্বালা হলেও দু'আড়াই শো টাকা খরচ হয়। জটিল ব্যাধি হলে তো কোন কথাই নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, পোশাক-আশাক, লুঙ্গি ধুতি গামছা যেগুলি নাহলে চলে না সেগুলিও প্রয়োজন মতো চাষী মজুররা কিনতে পারে না। চাষী পরিবারগুলিতে যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের কোন কাজ নেই, তারা বেকার। যেটুকু জমি আছে তাও রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় বছরে একবারের বেশি চাষ হয় না। জলের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। বৃষ্টি হলে ভাল, নাহলে সব শেষ। বন্যা-খরা তো লেগেই আছে। সরকার কার্যত সেচের ব্যবস্থা করতে পারেনি। যেসব ছোট ছোট নদীতে শীতকালে জল পুরোপুরি শুকিয়ে যায়, সেইসব নদীতে বাঁধ দিয়ে বর্ষার জল আটকাবার কোন পরিকল্পনা নেই। সমস্ত পতিত জমি উদ্ধার হয়নি, সরকারি খাস জমি সব বিলিবন্টন হয়নি, হলেও এমনভাবে হয়েছে যে চাষী কাগজ পেয়েছে, কিন্তু জমি পায়নি। এসব দিকে সরকারের কোন নজর নেই। বীজ, সার ও কীটনাশকের মালিকরা, ডিলার-হোলসেলার এবং রিটেলাররা সার-বীজ ও কীটনাশকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে, বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বেশি দামে চাষীদের কিনতে বাধ্য করছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আমন ধানের সীজনে ইউরিয়া সার বিক্রি হয়েছে ৫০ কেজির বস্তাপ্রতি সরকার ধার্য দামের চাইতে এক-দেড়শো টাকা বেশি দামে। এমনকী সেইসময় ইউরিয়া সার সাধারণভাবে কোন দোকানে পাওয়া যায়নি। রবিচাষের মরশুমে আলু, গম ও সরষের পক্ষে ডিএপি, সুফলা, ১০ঃ২৬ এই তিনপ্রকার সারও, যেসব জেলায় এসব ফসল চাষ হয় সেসব জেলার বাজারে পাওয়া যায়নি। আবার সরকারি ধার্য দামের চাইতে একশ-দেড়শ টাকা বেশি দাম দিলে তা মিলেছে। সরকারি আমলা, কৃষিমন্ত্রী, রাজ্য সরকার, বিভিন্ন শাসকদল ও তাদের কৃষক সংগঠন সবই আছে, নেই কেবল চাষীদের হয়ে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কেউ। আছে একটিই মাত্র প্রতিবাদী দল এস ইউ সি আই, আর তার কৃষক খেতমজুর সংগঠন কে কে এম এস। একমাত্র তারাই পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তে প্রান্তে চাষী-মজুরের স্বার্থে প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই সংগ্রাম পরিচালনা করে চলেছে, সংগঠিত করছে গ্রামবাংলার চাষী মজুরদের। গড়ে তুলছে প্রতিরোধের গণকমিটি, সংগ্রহ করছে ভলান্টিয়ার বাহিনী — যা দেখে শাসকশ্রেণী ভীত-সন্ত্রস্ত।

এদেশের কৃষকরা জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রজাসত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জমির ওপর ন্যায্য অধিকার কায়েম করেছে। জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে গরিব বর্গাদারদের ঐতিহ্যমণ্ডিত তেভাগা আন্দোলনও পরিচালিত হয়েছে। তারও আগে এদেশের কৃষকরা ইংরেজ নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়েছে। এদেশের কৃষকদের রয়েছে এক সুদীর্ঘ লড়াইয়ের ঐতিহ্য। এই কৃষকরা জমিদারী শোষণ যেমন মেনে নেয়নি তেমনি আজ কৃষিতে নেমে আসা পুঁজিবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, মহাজনি শোষণ যে নানান রূপে ক্রিয়াশীল রয়েছে তারও বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হবে— এও এক অনিবার্য বাস্তবতা। গ্রামে-গঞ্জে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে এ লড়াই গড়েও উঠছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং এদেশে তার বিশেষীকৃত রূপ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই কৃষক-শ্রমিকের হাতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যুগভিত্তিক হাতিয়ার। এই আদর্শে বলীয়ান হয়েই কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন কে কে এম এস লড়াই করে যাচ্ছে। আগামী ২৮ জানুয়ারি কৃষিজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে কে কে এম এস কলকাতায় মহামিছিলে সামিল হওয়ার ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। বঞ্চনাকে শোষণকে জীবনের ভবিতব্য বলে তারা মানতে নারাজ।

কোচবিহার

হলদিবাড়ীতে কৃষক বিক্ষোভ

হলদিবাড়ী ব্লকে বর্তমান রবি মরশুমে পর্যাপ্ত রাসায়নিক সারের অভাবে ব্যাপক অংশের গরিব চাষী গভীর সঙ্কটে পড়েছে। সারের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় লঙ্কা চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। এই কৃত্রিম সার সংকটের প্রতিবাদে ২৩ ডিসেম্বর সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের হলদিবাড়ী ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ব্লক কৃষি অধিকর্তার দপ্তরে চাষীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সারের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে এবং মজুতকারী ও সার ব্যবসায়ীদের কালোবাজারীর বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি মিছিল হলদিবাড়ী শহর পরিক্রমা করে। হলদিবাড়ী বাসস্ট্যান্ডে একটি প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের হলদিবাড়ী ব্লক কমিটির সম্পাদক কমরেড আবদুস সাত্তার সরকার এবং জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড রুহুল আমিন।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেসরকারীকরণ

বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব

২৮ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই দলের পরিষদীয় নেতা বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার রাজ্য বিধানসভায় নিম্নোক্ত মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অধ্যক্ষ কেবল প্রস্তাবটি পাঠ করার অনুমতি দেন।

'প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ'-এর অন্তর্ভুক্ত করে এই রাজ্যে আনুমানিক ১০০০ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৬০টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১০০টি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং ১০,৩৫০টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১২,০০০ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতাল বেসরকারি সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থাগুলি ওষুধপত্র থেকে শুরু করে সব কিছুই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লেনদেন করার সুযোগ পাবে। এবং এটাও স্থির হয়েছে যে, চুক্তির ভিত্তিতে লিজ নেওয়া এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সরকারি কর্মীরা থাকতেও পারেন, অথবা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার কর্মীরাই কাজ চালাবেন। সরকারি এই সিদ্ধান্তে ব্যবসায়ীদের অবাধ মুনাফা লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা দুর্মূল্য হয়ে উঠবে এবং রাজ্যের অগণিত গরিব, নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে যতটুকু সুলভ চিকিৎসার সুযোগ পেত তার থেকে বঞ্চিত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই জনস্বার্থে গ্রামীণ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসরকারীকরণের এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি।''

এ আই ডি এস ও'র ৫০ বর্ষ

সংগ্রামের ইতিহাস ও উদ্ধৃতি প্রদর্শনী মুগ্ধ করল মানুষকে

কলেজ স্কোয়ারে নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশ বহু লড়াই আন্দোলনের পীঠস্থান। পাশেই স্থাপিত স্বাধীনতা আন্দোলনের তিন উজ্জ্বল রত্ন বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্য সেন ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা নির্মল সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের আবক্ষমূর্তি। ২৭ ডিসেম্বর বিকাল ৫টায় এখানেই ছিল ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ৫০ বছরের সংগ্রামের চিত্র ও মনীষীদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী। এঁদের মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠাপর্বের অন্যতম সংগঠক ও বর্তমানে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায়। মাস্টারদা সূর্য সেনের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল। গুজরাটের ছাত্রনেতা জয়েশ প্যাটেল এবং কেরালার ছাত্রনেতা শ্রীজিৎ সুধাকর যথাক্রমে নির্মল সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এরপর ডি এস ও'র ওপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্ণাটকের প্রাক্তন ডি এস ও প্রেসিডেন্ট কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ। প্রধান বক্তা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত আসনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীমের পরিণতিতে যে শিক্ষা সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তারই বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে ডি এস ও সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেইসময় অবিভক্ত এ আই এস এফ, পি এস ইউ এবং ছাত্র ব্লক শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন ছিল, কিন্তু পুঁজিবাদের স্বার্থেই যে শিক্ষা সংকোচনের ষড়যন্ত্র এটা তারা সেদিন ধরতে পারেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত এই বিশ্লেষণ যে সত্য, ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান সি ডি দেশমুখের বক্তব্যেই তা প্রমাণিত হয়েছিল। এক বিরাট সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ডি এস ও আজকের জায়গায় এসেছে, সামনে রয়েছে আরও বৃহৎ সংগ্রাম।

২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এই প্রদর্শনী। ভোর ৪টার প্রাতঃভ্রমণকারীদের থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ, বইপাড়ার দোকানদার-কর্মচারীসহ অসংখ্য মানুষ চারদিন ধরে গভীর রাত পর্যন্ত ভিড় করেছেন এই প্রদর্শনীতে। এখানে তুলে ধরা হয়েছিল ডি এস ও'র ৫০ বছরের সংগ্রামের ইতিহাসের কিছু দিক, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ, শিবদাস ঘোষ থেকে শুরু করে টলস্টয়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিবারাও ফুলে, প্রেমচন্দ, নজরুল, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, গোপবন্ধু দাস, সহ আরও অনেক মনীষী — যাঁরা সমাজসভ্যতার অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের কিছু শিক্ষা। বহু

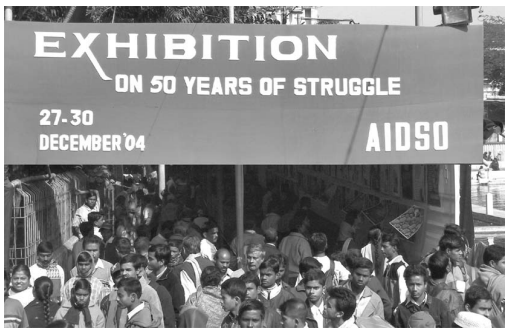

ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ ধৈর্য ধরে উদ্ধৃতিগুলি খাতায় তুলে নিয়েছেন, আবার অনেকে এই উদ্ধৃতির সংকলন চেয়েছেন। গৌরবোজ্জ্বল বহু সংগ্রামের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের মনীষীদের শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবান বক্তব্য একদিকে যেমন মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনই গণআন্দোলনে ডি এস ও কর্মীদের উপর সিপিএম, এস এফ আই এবং পুলিশের হিংস্র, বর্বর আক্রমণের ছবিগুলি দেখে দুঃখে-ব্যথায় নির্বাক হয়ে গেছেন বহু মানুষ। ডি এস ও'র মহিলা কর্মীদের উপর পাশবিক অত্যাচারের একটি ছবির সামনে বহু প্রবীণ ব্যক্তি চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এঁদেরই একজন সিপিএম-এসএফআই সম্পর্কে বললেন, 'যৌবনে এদেরই সাথে পা মিলিয়ে ভাবতাম, আমরা বিপ্লব করব। আর আজ ...ছিঃ।' মাঝবয়সী কেউ কেউ বলেছেন, 'এই অত্যাচারের কোন প্রতিকার কি হয় না ভাই!' বহু ছাত্র এগিয়ে এসে বলেছেন, 'আমি আপনাদের সদস্য হতে চাই।' এভাবেই বহু মানুষকে জাগিয়ে, নতুন সংগ্রামের শপথের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এই প্রদর্শনী।

'ডিএসও কর্মীদের হতে হবে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের ভলান্টিয়ার'

চারের পাতার পর

সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের অনেকেই আজকের সমাবেশে উপস্থিত আছেন। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড মানিক মুখার্জী, আমার দাদাস্থানীয় কমরেড রণজিৎ ধরের ভূমিকা আপনারা জানেন। মানিক মুখার্জী অবশ্য অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ সময় ডি এস ও'র কাজ করতে পারেনি। এছাড়া ছিলেন প্রয়াত কমরেড গায়ত্রী দাশগুপ্তা, ছিলেন কমরেড সাধনা চৌধুরী। এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে ডি এস ও'র সূচনা ঘটাতে এঁরা অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এঁদের এবং আরও অনেকের সংগ্রামের ফলই হচ্ছে আজকের ডি এস ও। গত ৫০ বছরে বহু ছাত্র আন্দোলনে, গণআন্দোলনে হাজার হাজার ডি এস ও কর্মী কারারুদ্ধ হয়েছেন, গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে ডি এস ও ছাত্রদের দাবি নিয়ে, জনগণের দাবি নিয়ে লাগাতার লড়াই করছে। ডি এস ও কর্মীরা সাইক্লোন-ভূমিকম্পে-বন্যায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান। দেশজুড়ে হাজার হাজার ফ্রি কোচিং ক্লাস, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন। এই ডি এস ও কর্মীরাই নবজাগরণের মনীষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান বিপ্লবীদের স্মরণ অনুষ্ঠান করেন, যাতে আজকের ছাত্র-যুবদের উন্নত চরিত্রের সাধনায় অনুপ্রাণিত করা যায়।

তিনি বলেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বৈপ্লবিক ছাত্র আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, যা ছিল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অঙ্গ। আমরা অল ইন্ডিয়া ডি এস ও গড়ে তুলেছি স্বাধীনতার পর পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের স্তরে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ছাত্রসংগঠন হিসাবে। বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক পাঠক্রমের ও সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগের যে দাবি ডি এস ও জন্মলগ্নেই উত্থাপন করেছিল, সেই দাবি নবজাগরণের মনীষীরা, স্বদেশী আন্দোলনের নেতারাই তুলেছিলেন। স্বাধীন ভারতে ডি এস ও'কে এই দাবি তুলতে হল, তার কারণ ভারতের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শাসকরা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দূরের কথা, সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য একের পর এক স্কীম নিয়েছে, আজ আরও বেশি নিচ্ছে। সকলের জন্য শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরকার বলছে, যার টাকা আছে, সে পড়বে ; যার টাকা নেই, সে পড়তে পারবে না। কেন এই অবস্থা, তার সন্ধান দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ভারতের পুঁজিবাদ একচেটিয়া স্তরে এসে সর্বাত্মক সংকটে জর্জরিত। তীব্র বেকার সংকটসহ কোন সমস্যারই সে আর সমাধান করতে পারে না। ফলে, পুঁজিবাদ আজ জ্ঞানচর্চা ধ্বংস করতে চায়, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ধ্বংস করে ধর্ম, কুসংস্কারভিত্তিক চিন্তাভাবনার প্রসার চায়। শিক্ষাকে বাজারের পণ্য করে শিক্ষিতের সংখ্যা কমাতে চায়। এটাই আজকের পুঁজিবাদের প্রয়োজন, পশ্চিমেও তাই ঘটছে, ভারতেও তাই। এদেশেই বিদ্যাসাগর ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত শিক্ষার ধ্বনি তুলেছিলেন। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, সকল ধর্মই মিথ্যা, আদিম যুগের কুসংস্কার, বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নেই। ফাঁসির দড়ি পরার সময় ভগৎ সিং বলেছিলেন, আমি নাস্তিক, আমি গীতা চাই না, আমার গীতা লেনিনের বই, সেটা আমায় দাও। রবীন্দ্রনাথ নিজে ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েও বলেছিলেন, শিক্ষা হবে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে। সুভাষ বোস বলেছিলেন, শিক্ষার সাথে, রাজনীতির সাথে ধর্মকে যুক্ত করা উচিত নয়। এঁদের সকল বক্তব্য ও শিক্ষাকে আজ জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা, জাতিভেদ, গোঁড়ামি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এসবই করা হচ্ছে ভারতের সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন যে, সকলের জন্য শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবি নিয়ে আন্দোলনকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে।

দেশের খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ, গরিব শ্রমিক-কৃষকের জীবনের মর্মান্তিক অবস্থা তুলে ধরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই সর্বাত্মক সংকটের বিরুদ্ধে কারা সংগ্রাম করবে? যৌবন মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়। পরিবার বলুন, সমাজ বলুন — সংকটে মানুষ তাকায় যুবকের দিকে। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আদর্শের টানে তেজের সাথে লড়তে পারে যৌবনের শক্তিই। ডি এস ও'র কর্মীরা সেই সম্পদের অধিকারী, তাই দেশ, সমাজ তাকিয়ে আছে তাদের দিকে, প্রত্যাশা তাদের নিয়ে। ডি এস ও কর্মীরা যখন রক্ত ঢেলে লড়াই করে, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বয়স্করা, প্রবীণরা মুগ্ধ হয়ে দেখেন, তাঁরা খুঁজে পান তাঁদের যৌবনের দিনগুলোকে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কংগ্রেস বিজেপি'র মতো বুর্জোয়া দলগুলো, সিপিএম-এর মতো বামপন্থী বুলি আওড়ে বুর্জোয়াদের সেবাদাস দলগুলো আজ আর কোন উন্নত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে না। এদের কাছে রাজনীতি মানে নীতিহীনতা, ভন্ডামি, লোকঠকানো। আজ একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত রাজনীতিই চরিত্র দিতে পারে। এই আদর্শকে হাতিয়ার করে ডি এস ও'র প্রতিটি কর্মীকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের ভলান্টিয়ার হিসাবে গড়ে উঠতে হবে, বিপ্লবী চরিত্র ও সংস্কৃতি অর্জনের সাধনায় ব্রতী হতে হবে। আমি ও অন্যান্য যারা আজ এই মঞ্চে আছি, তারা সকলেই প্রৌঢ়ত্বের বয়সও অতিক্রম করেছি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে হাতিয়ার করে যেভাবে ডি এস ও এগিয়ে চলেছে, অন্যান্য গণসংগঠন এগোচ্ছে, হাজার হাজার বিপ্লবী তৈরি হচ্ছে এবং যেভাবে এই আদর্শের প্রভাব বাড়ছে, তাতে সংগঠনের আরও বিস্তৃতি ঘটবে, নতুন নতুন আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হবে। প্রতি বছর ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হবে বৃহত্তর শক্তি নিয়ে। ৫০ বছর পর এক ২৮ ডিসেম্বর ডিএসও'র প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে, এবং আমরা বিশ্বাস করি, শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে শোষণমুক্ত শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষে।

এছাড়া এ আই ডি এস ও'র যেসব রাজ্য নেতারা বক্তব্য রাখেন, তাঁরা হলেন, কমরেডস্ গোবিন্দ রাজালু (অন্ধ্রপ্রদেশ), রাম অবতার শর্মা (মধ্যপ্রদেশ), ওমপ্রকাশ (হরিয়ানা), সাজর খান (কেরালা), রাজেন্দ্র ভার্মা (ওড়িশা), দীপক কুমার (বিহার), ইন্দরজিৎ (পাঞ্জাব), রাজমল শর্মা (রাজস্থান), জিতেন চালিহা (আসাম), মোহন সিং (ঝাড়খন্ড), বাবুল বণিক (ত্রিপুরা), জয়েশ প্যাটেল (গুজরাট), প্রমোদ কাম্বলে (মহারাষ্ট্র), প্রকাশ সাইনি (দিল্লি), লীলাময় মন্ডল (ছত্তিশগড়) । পশ্চিমবঙ্গের কমরেড নভেন্দু পাল সিরিয়া ও কিউবার ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর পাঠানো বার্তা সভায় পড়ে শোনান। সকল রাজ্যের ছাত্রনেতাদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে এ আই ডি এস ও'র সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা।

মাল্যদান করেছেন

২৮ ডিসেম্বর, ২০০৪ এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদান করেন — কমরেডস্ সদানন্দ বাগল, সাধনা চৌধুরী, ছায়া মুখার্জী, সলিল চক্রবর্তী, প্রশান্ত ঘটক, বিষ্ণু দাস, রতন মুখার্জী, ভেনুগোপাল।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন — কমরেডস্ রণজিৎ ধর, সঞ্জিত বিশ্বাস, বিধান চ্যাটার্জী, ভাস্কর গুপ্ত, সুজিত ভট্টশালী, ভারতী মৈত্র, মিহির রায়, বীণাপাণি দাশ, ধূর্জটি দাশ, রবীন সমাজপতি, দীপঙ্কর রায়, বিমল জানা, বি আর মঞ্জুনাথ।

রানি রাসমণি রোডে শহীদ কমরেড মাধাই হালদারের স্মরণবেদীতে মাল্যদান করেন — কমরেডস্ সান্টু গুপ্ত, স্বপন চ্যাটার্জী, জগন্নাথ ভার্মা, কান্তিময় দেব, চন্ডীদাস ভট্টাচার্য, প্রণতি ভট্টাচার্য, কে উমা, রমেশ পট্টনায়েক, বি কে রাজাগোপাল, প্রণতি কর, রূপম চৌধুরী, সুজাতা ব্যানার্জী, ছবি মহান্তি, অজিত আচার্য, মদন ঘটক।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

ইউক্রেনে সঙ্কট

সাম্রাজ্যবাদ থাবা বিস্তার করছে পূর্বদিকে

পাঁচের পাতার পর

বলে অভিহিত করা হলেও তিনি প্রেসিডেন্ট হলে রুশদের অবস্থাই আরও খারাপ হবে। 'পি বি এন' নামের ইউক্রেনের এক পরামর্শদাতা সংস্থার প্রধান মাইরন ওয়াসিলিক বলেছেন, ''ইয়ানুকোভিচ যে ইউক্রেনের শিল্পপতিদের জন্য সংরক্ষণ নীতির পক্ষে — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'' তিনি বলেছেন, ''ইয়ানুকোভিচ রুশ এবং পশ্চিমীদের পথ আটকে রেখে সবকিছু ইউক্রেনবাসীদেরই দিয়ে দিয়েছেন।''

আর আই আই ডি পত্রিকায় আরো বলা হয়েছে যে, ইয়ুশচেঙ্কো প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই বিদেশি সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

ইস্পাত কারখানা নিলামের ঘটনা আসল চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে

রাজনৈতিকভাবে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে এবং সরকারি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রুশ ভাষা চালু করার পক্ষে সওয়াল করে ইয়ানুকোভিচ যতই 'রুশ তাস' খেলার চেষ্টা করুন, ইউক্রেনের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা 'ক্রাইভোরিস্টাল' নিলাম করার ঘটনায় তাঁর স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেছে। এ বছরের গোড়ায় ঐ কারখানাটির জন্য নিলাম ডাকা হয়। রাশিয়ার সেভেরস্টালসহ বিশ্বের তাবড় ইস্পাত কোম্পানিগুলি সকলেই নিলামে অংশ নিতে চেয়েছিল ; কিন্তু ইউক্রেনের পার্লামেন্টের বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত এক কমিটি টেন্ডারের শর্ত পরিবর্তন করে বিদেশি সংস্থাগুলোকে নিলামে অংশ নিতে দেয়নি। এর ফলে সংস্থাটির দাম পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৮০ কোটি ডলারের বিনিময়ে ঐ কোম্পানি কিনে নেয় ইউক্রেনেরই একটি কোম্পানি, যার মালিক হচ্ছেন আবার কুচমার জামাতা পিনচুক এবং আখমেতভ। রাশিয়ার সেভেরস্টাল কোম্পানি ১২০ কোটি ডলার দাম দিতে রাজি থাকা সত্ত্বেও ইয়ানুকোভিচের সরকার তাদের কাছে ইউক্রেনের কারখানাটি বিক্রি করেনি। এ তথ্য দিয়েছে রুশ ইন্টারনেট পত্রিকা আর আই আই ডি।

আর আই আই ডি রুশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হওয়ায় এব্যাপারে যে তথ্যটি প্রকাশ করেনি, সেটি প্রকাশ করেছে ৮ নভেম্বরের 'বিজনেস উইক অনলাইন'। তারা বলেছে, পিনচুকের কোম্পানি মাত্র ৮০ কোটি ডলারে নিলাম জিতে নিলেও মার্কিন সংস্থা 'ইউ এস স্টিল কর্পোরেশন' কারখানাটির জন্য ১৫০ কোটি ডলার দাম দিতে চেয়েছিল।

বিজনেস উইক এবং আর আই আই ডি — দুই পত্রিকাই ইয়ুশচেঙ্কো সম্পর্কে একমত। দুই পত্রিকাতেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে লেখা হয়েছিল, ইয়ুশচেঙ্কোর মতো একজন পশ্চিমঘেঁষা রাজনীতিবিদ, যিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ইউক্রেনের রমরমা শুরু হয়েছিল, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতলে ইউক্রেনে সংস্কার কর্মসূচি জোরালো হয়ে উঠবে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের এক চমৎকার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে, যা আগে কখনো হয়নি।

কীভাবে ইউক্রেনে বিনিয়োগের বন্যা বইয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে 'বিজনেস উইক' বেশকিছু পরামর্শও দিয়েছে। তারা বলেছে, ''এখন সেখানে দরকার বৃহৎ উৎপাদনকারীদের।'' এই বৃহৎ পুঁজিপতিদের আকৃষ্ট করবে ''উচ্চশিক্ষিত অথচ সস্তা শ্রমিকবাহিনী। পোল্যান্ডে যেখানে একেক জন শ্রমিক পিছু মাসিক ব্যয় ৪০০ ডলার, ইউক্রেনে সেখানে সমস্ত রকম ট্যাক্স, লেভি সহ শ্রমিকপিছু ব্যয় মাত্র ১৬০ ডলার। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতে মজুরি ব্যয় যেখানে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, সেখানে ইউক্রেনের মজুরি ব্যয় শিল্পপতিদের কাছে রীতিমত লোভনীয়। সুতরাং, সামরিক দিক থেকে, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এবং উৎপাদন ব্যয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে ইউক্রেন এখন শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের স্বর্গরাজ্য।''

ইউক্রেনে ইয়ানুকোভিচ ও ইয়ুশচেঙ্কো গোষ্ঠীদুটির দ্বন্দ্বের ব্যাপারে আদৌ উদ্বিগ্ন নয় মার্কিন পুঁজিপতিদের মুখপত্র বিজনেস উইক। দুটি গোষ্ঠীই যে সুবিধাবাদী চরিত্রের — এ'কথা জানা থাকায় তারা নিশ্চিন্ত। বিদ্যুৎ কোম্পানি এ ই এস কর্পোরেশনের ইউক্রেনিয় ডিরেক্টর গ্যারি লিভেসলির বক্তব্য উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি মন্তব্য করেছে — ''যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, ইউক্রেনে সংস্কার কর্মসূচি চলতে থাকবে সেদেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তবে প্রশ্ন, উন্নতির গতি কত হবে সেটা নিয়ে।''

মার্কিন এবং ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা এখন নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুতি করছে। ইউক্রেনের সঙ্গে আর্থিক, সামরিক এবং মহাকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে রাশিয়া নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকায় ঐসব পুঁজিপতিরা রাশিয়াকে হুমকি দিয়েছে। ইউক্রেনকে 'ন্যাটো' জোটের মধ্যে নিয়ে আসতে সচেষ্ট ইয়ুশচেঙ্কোকে এরা সমর্থন করছে এবং ইয়ানুকোভিচকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টকে চাপ দিচ্ছে। ইউক্রেনে নিজেদের জায়গা করে নেবার জন্য এরা সেখানে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করে নিজেরাই এখন সেই ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক অবস্থাকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে এবং এ পথেই তারা অশান্তি সৃষ্টি না করে ধীরে ধীরে ইউক্রেনকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের আওতায় এনে ফেলতে চাইছে।

ইউক্রেনের বর্তমান পরিস্থিতি আসলে বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের সংকটের প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ১৯১৮ সালে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তির মাধ্যমে বলশেভিকদের কাছ থেকে ইউক্রেন কেড়ে নিয়েছিল। জার্মান পুঁজিপতিদের কাছে ইউক্রেন ছিল সম্পদে পরিপূর্ণ এবং সামরিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দেশ। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ এও ভেবেছিল যে ইউক্রেনের মতো সম্পদশালী দেশ হাতছাড়া হয়ে গেলে বলশেভিক সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে হিটলার কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইউক্রেন দখল করেছিল। হিটলারের চোখেও ইউক্রেন ছিল বিনিয়োগ করার, উপনিবেশ তৈরি করার এবং সেদেশের মানুষকে দাস বানানোর এক উপযুক্ত স্থান। বিশ্ব দখল করার জন্য ইউক্রেনকে দখল করাটা তার কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বাজার, কাঁচামালের নতুন উৎস এবং নতুন শ্রমিক জোগাড় করাটা ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন।

হিটলার সেইসময় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জার্মানির যেসব সামাজিক সংকটের সমাধান করতে চেয়েছিল, তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সামাজিক সংকটের তুলনা হয় না, একথা ঠিক। তবে যে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি হিটলারকে ইউক্রেন গ্রাস করার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, বর্তমানে মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ক্রমাগত পূর্বদিকে বিপজ্জনকভাবে থাবা বিস্তারের পিছনেও কাজ করছে সেই একই শক্তি।

[ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড (নিউইয়র্ক), ৯-১২-০৪ থেকে]

সুনামি বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যে এস ইউ সি আই ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

২৮ ডিসেম্বর কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে ছিল এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সমাবেশ। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো তামিলনাড়ুর কর্মীদেরও এই সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। প্রস্তুতিও ছিল অন্তিম পর্যায়ে। এমন সময়ে, ২৬ ডিসেম্বর ঘটে গেল ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সমাবেশে যোগ দেওয়ার কর্মসূচি বাতিল করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রাণের কাজে। সুনামি বিধ্বস্ত এলাকাগুলির দুর্গত মানুষের জন্য চিকিৎসা, ওষুধপত্র, পানীয় জল, খাদ্যের ব্যবস্থা করতে সাধারণ মানুষের উদার হস্তের সাহায্য সংগ্রহেও নেমেছেন গোটা দেশজুড়ে দলের কর্মী-সমর্থকরা।

সরকারি আমলাতান্ত্রিকতা, সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার অভাবে দুর্গত মানুষের অবস্থা ভয়াবহ। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতা সরকার ঘোষণা করেছে, সরকার ছাড়া অন্য কেউ ত্রাণসংগ্রহ ও বিতরণ করতে পারবে না। অথচ বিপর্যস্ত মানুষ সহায়-সাহায্যের অভাবে ধুঁকছে, মৎস্যজীবীদের অবস্থা ভয়ানক। এই অবস্থায় তামিলনাড়ুর এস ইউ সি আই কর্মীরা সরকারি নিষেধাজ্ঞায় নিরস্ত না হয়ে ত্রাণসংগ্রহে নেমেছেন, দুর্গত এলাকাগুলিতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে কাড্ডালোর, নাগাপট্টনম জেলা ও পণ্ডিচেরিতে কর্মীদের তিনটি টিম সবচেয়ে অবহেলিত এলাকাগুলির খোঁজ নিয়ে সেখানে কী কী ত্রাণসামগ্রী, কোন্ ধরনের ওষুধ, চিকিৎসার জন্য কোন্ ধরনের চিকিৎসক পাঠানো দরকার তা জেনে এসেছে যাতে ত্রাণের কাজ পরিকল্পিতভাবে করা যায়। কাড্ডালোর জেলার সবচেয়ে অবহেলিত কোটনোভা ও দেবনমপট্টিনাম অঞ্চলে দুর্গত মানুষেরা এগিয়ে এসে এস ইউ সি আই কর্মীদের পরিস্থিতি বুঝতে সহায়তা করেছেন। এই দুটি অঞ্চলে এস ইউ সি আই ত্রাণশিবির খুলেছে। বিভিন্ন রাজ্য ইউনিট থেকে ত্রাণসামগ্রী ও চিকিৎসক-স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠানো শুরু হয়েছে। ৩ জানুয়ারি সর্বভারতীয় শোকদিবসে চেন্নাইয়ের টানা স্ট্রিটে শোকবেদীতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং রাজ্য সংগঠনী কমিটির পক্ষে কমরেড আর জয়পাল। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত পথসভায় জয়ললিতা সরকারের অমানবিক ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ৪ জানুয়ারি দুর্গত মানুষের দাবিসম্বলিত একটি স্মারকপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়।

কারা দায়ী

একের পাতার পর

মন্ত্রীর নাম-ঠিকানাই রয়ে গেছে। আমাদের সরকারি দপ্তর কীভাবে চলছে এ থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া সরকারি দপ্তরের কর্মী-অফিসারদের দক্ষতাও এমন জায়গায় নেমেছে যে তাঁরা তাঁদের পরিবর্তিত মন্ত্রীর নামও জানেন না। এটা লজ্জাকর। এ বিষয়ে ভয়ানক তথ্য সাংবাদিকরা জানিয়েছেন — ''মূল ভূখণ্ডে ঢেউয়ের আঘাত আসার অন্তত ঘন্টাখানেক আগে ভারতীয় বিমানবাহিনী জানত যে নিকোবরে তাদের বিশাল ঘাঁটি সম্পূর্ণ জলের তলায়। তবুও কোনও আগাম খবর দেওয়া গেল না। ভূকম্পনের কয়েক মিনিটের মধ্যে খবর পেয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ভূমিকম্প নিয়ে সরকারি দপ্তরের মধ্যে ফ্যাক্স বিনিময়ও হয় বেশ কয়েকটি। তবু দেশের মানুষের কাছে পৌঁছানো গেল না কোনরকম সতর্কবার্তা।.... সমুদ্রগর্ভে ভূকম্পনের ফলে উদ্ভূত কালান্তক সুনামি ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডকে তছনছ করে নিকোবরের বিমানঘাঁটিকে ডুবিয়ে আড়াই ঘন্টা পরে ভারতের মূল ভূখণ্ডে ধাক্কা মারে। এই গুরুত্বপূর্ণ আড়াই ঘন্টাকে কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষকে কেন কোনও খবর দিতে পারল না সরকার, তার কোনও ঠিকঠাক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।'' এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসার যা বলেছেন, তা প্রশাসনের আসল চেহারা বুঝিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন, ''এটাও মনে রাখতে হবে, সেদিন রবিবার ছিল, অফিসারদের তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠতে খানিকটা তো সময় যাবেই'' (আনন্দবাজার, ২-১-০৫)। এখন জানা যাচ্ছে, ১৯৯৯ সালে ওড়িশার বিপর্যয়ের পর এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কী আগাম ব্যবস্থা নিয়ে রাখা দরকার, তা স্থির করার জন্য বিজেপি সরকার একটি কমিটি করেছিল এবং তারা যে সুপারিশ করেছিল, সেগুলি পাঁচ বছর ফাইলবন্দিই হয়ে আছে। যে দেশে মন্ত্রী-আমলারা ভোগবিলাসে ডুবে থাকে, দুর্নীতি-কেলেঙ্কারিতে আকণ্ঠ মগ্ন, সে দেশে এ জিনিস হবেই। আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এর বাইরে কিছু দিতে পারেনা। যত দ্রুত এর অবসান হয় তত মঙ্গল। ফলে এই যেখানে দেশের সরকার ও প্রশাসনের চেহারা ও চরিত্র, সেদেশে শীতে-গ্রীষ্মে, ঝড়ে-বন্যায়, জলোচ্ছ্বাসে অসহায় মানুষ মরবেই, সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারি হবেই।

দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী, গণতন্ত্র ও মানবতার স্বঘোষিত পাহারাদার মার্কিন সরকারের ভূমিকাই বা কী দেখা যাচ্ছে ? লক্ষ লক্ষ মানুষের এই বিপর্যয়ে মার্কিন সরকার মাত্র ৪০ লক্ষ ডলার সাহায্যের ঘোষণা করেছিল, পরে যেটা বাড়িয়ে করেছে ৩৫ কোটি ডলার। এই মার্কিন সরকারই ইরাককে ধ্বংস করতে কত শত কোটি ডলার প্রতিনিয়ত ঢেলে যাচ্ছে ? মার্কিন সরকারের সামরিক বাজেটের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি ডলার। কী কাজে তা খরচ করা হয় ? বিশ্বজুড়ে মানুষ মারতে, দেশের পর দেশ ধ্বংস করতে পারার মতো নিত্যনতুন অস্ত্র উদ্ভাবনে। বোঝাই যায়, মানুষকে বাঁচাতে নয়, মারতেই মার্কিন শাসকদের আগ্রহ।

আমরা নিশ্চিত যে, সর্বস্ব হারানো অসহায় মানুষদের বাঁচার দাবি নিয়ে যদি ঐসব রাজ্যগুলিতে জনআন্দোলন গড়ে তোলা না যায়, তবে অনাহার ও মহামারী আরও কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন ছিনিয়ে নেবে। এই মুহূর্তে তামিলনাড়ুতে ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অবহেলার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net